চাঁদাবাজির অর্থ(রাজ)নীতি

সত্যিই, কি বিচিত্র এই দেশ!

হিফজুর রহমান

কেস স্টাডি-১

চট্টগ্রামের একটি বিখ্যাত স্কুল ও কলেজের শিক্ষিকা নিতান্তই সাংসারিক কিছু সীমিত বিলাসিতা করার জন্যে তার প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে কিঞ্চিদধিক লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন। ওই ঋণ পরিশোধ করবার জন্যে প্রতিমাসে তাকে প্রায় চার হাজার টাকা করে কিস্তি শোধ করতে হয়। এর ফলে ইতোমধ্যেই তার সীমিত আয় আরো সীমিত হয়ে পড়েছে। ফলে, এখন তার অনেক নৈমিত্তিক প্রয়োজনেও ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনেকটাই আপোষ করতে হয়।

কেস স্টাডি-২

গাজীপুরের ভবানীপুরের এক যইফ বুড়োমানুষ যার প্রতি তার নিজের গড়া সংসারই বিরূপ হয়ে গেছে, সেই বুড়ো মানুষ এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান থেকে মাত্র দুই হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন কেবলই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে। তাতেই তিনি অত্যন্ত খুশী এবং সুখি। কারণ, ওই টাকা দিয়ে ফল শব্জি বেচাকেনা করে দিনে তার নেই নেই করেও শতাধিক টাকা আয় হয়ে যায়। তাতেই তার দু'বেলা খাবার জুটে যায়, জুটে যায় ছেঁড়াফাটা কাপড়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তারপর তিনি কিছু দানধর্মও করেন। অত্যন্ত সুখি মানুষ আমার ওই চাচা।

কেস স্টাডি-৩

গনতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষায় ওষ্ঠাগত প্রাণ রাজনৈতিক দল বিএনপি'র এক নেতা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি অবলীলাক্রমে বলে গেছেন, কতো কোটি টাকা তিনি নিয়েছিলেন কি কি দুষ্কর্ম সাধনের জন্যে। তিনি মানুষ একজন, পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতোজন জানা নেই। কিন্তু, কেবল বসুন্ধরাতেই তার প্লটের সংখ্যা পাঁচটি সোয়া বিঘার। দাম কতো হবে তার? অন্ততঃ দুই কোটি পঁচিশ লাখ। স্বদেশ প্রপার্টিতে আছে ছয়টি প্লট। তার দাম কতো হবে জানিনা। কেবল মাথার হিসেবে সেটা বের করা সম্ভবও নয়। তার ওপর বর্তমান সরকারের কাছে ঘুষেরই কেবল বিশ কোটি টাকা ফেরত দিয়েছেন তিনি। ওই টাকা নাকি তিনি নিয়েছিলন এক খুনিকে বাঁচাবার জন্যে এবং তার এই সদিচ্ছায় নাকি তার আপোষহীন নেত্রীরও সায় ছিল। মূল চুক্তি ছিল পঞ্চাশ কোটি টাকার। কুড়ি কোটি টাকা ছিল অগ্রীম। সেটাই তিনি ভালো মানুষের মতো ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। এই সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ব্যাংকে কতো কোটি টাকা আছে কে জানে! ধীরে ধীরে জানবো নিশ্চয়ই।

কেস স্টাডি-৪

আমাদের দেশে ৩০ এপ্রিল তারিখটি খুব হাস্যকর দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে বেশ কিছুদিন ধরেই। এই হাস্যকর তারিখটির জনক এদেশের সবচেয়ে বড়ো ও এতিহ্যবাহি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মাননীয় সাধারন সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল। তিনি ওই দিন ক্ষমতাসীন বিএনপি'কে ট্রাম্পকার্ড দেখিয়ে দেবেন বলে ঘোষনা দিয়েছিলেন, সেকথা সবারই জানা। আর তার ওই হাস্যকর দাবির কোন প্রতিবাদ করেননি দেশনেত্রী শেখ হাসিনাও। সেই আবদুল জলিল এবার অনেকই সমস্যায় ফেলে দিয়েছেন অনেক কথা বলে। পত্রিকার খবরে জানতে পারলাম তার প্রতি "খুশী হয়ে" মার্কেন্টাইল ব্যাংক ষাট লাখ টাকার শেয়ার "উপহার" দিয়ে দিয়েছিল। যে উপহারের জোরে তিনি এখনো পর্যন্ত সেই ব্যাংকের চেয়ারম্যান। তার নেত্রী এবং তার দলের আরো সব

সুকৃতিবান নেতারও অনেক চাঁদাবাজি জাতীয় সুকর্মের কথাও নাকি তিনি গড়গড় করে বলে দিয়েছেন। আরো অনেকের কথাও শিগগিরই আমরা জানতে পারবো বলে অনুমিত হয়।

কেস স্টাডি-৫

সম্ভবতঃ ২০০৩ সালেরই ঘটনা। একটি বিদ্যুৎ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওই কোম্পানীরই অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্টর-এর অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সম্মত না হওয়ায় তাকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় হাওয়া ভবনের বলে বলিয়ান ওই ঠিকাদার কোম্পানী। ফলাফল, উক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সরেই যেতে হয়। আর এর বিনিময়ে তারেক রহমানের স্যাঙ্গাত গিয়াসউদ্দীন আল মামুন লাভ করেন একটি ঝাঁ চকচকে কালো পাজেরো গাড়ি। গাড়িটির দামও সম্ভবতঃ পঞ্চাশ লাখ টাকারই কাছাকাছি ছিল। ওই অকান্ড ঘটাবার জন্যে ঠিকাদার কোম্পানীকে আরো অনেক "দ্যাবতা"কেই তুষ্ট করতে হয়েছিল ক্যাশ ও কাইন্ড দিয়ে।

এহ সব খন্ডচিত্র

এই হলো আমাদের দেশের কিছু খন্ডচিত্র। গত ছয় মাস প্রায় অসুস্থতার কারণে আমি প্রায় শয্যাগত ছিলাম। রোগের নাম গুলেন বারি সিনড্রোম। এতে নাকি নার্ভাস সিস্টেমের যথেষ্ঠ ক্ষতি হয়। এই সময়ে টেলিভিশন দেখা আর সংবাদপত্র পড়া ছাড়া আর কোন কাজ করা প্রায় কঠিনই। আর সংবাদপত্র আর ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের যাবতীয় সুকৃতি (!) পড়ে ও দেখে আমার অসুস্থতা বাড়ছে বই কমছেনা। অ্যাতো কোটি টাকার দুর্নীতির গল্প শুনছি যে এখন লক্ষ টাকাকেও বড়োই অকিঞ্চিতকর মনে হয়। জানিনা হাজার টাকার মালিকরা কি ভাবছেন। তারা কি তাদের হাজার টাকার সাথে কোটি টাকার কোন তুলনা করতে বা কোন হিসাব মেলাতে পারছেন? যে মানুষগুলো এখন একসময়ের শস্তার তেলাপিয়া মাছ কিনতেও দশবার চিন্তা করেন সেই তারাই যখন এদেশেরই কোন রাজনৈতিক নেতা বা নেতার স্যাঙ্গাতদের কোটি টাকার গাড়ি চড়ার কথা শোনেন তখন তাদের কি মনে হয়, জানতে খুব ইচ্ছে করে।

এক রিক্সাচালক একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, বাবা ওই সব গাড়ির সিট কি পিলেনের মতো? আমি পালটা জিজ্ঞেস করলাম, প্লেন-এর সিট কি দেখেছেন কখনো? কোন উত্তর পাইনি। কারণ, ওই বেচারা তো জীবনে প্লেনে চড়ার স্বপ্নও দেখতে পারবেনা। সুতরাং প্লেনের সিটের কথা জানবে কি করে? এই দেশে এখনো অনেক মানুষ একটি এক ব্যান্ডের রেডিও কেনার স্বপ্ন দেখতে দেখতেই মরে যায়। আর এরকম দেশে কোন রাজনৈতিক নেতার একশ বায়ান্ন বিঘা জমির মালিকানার গল্প বা কোন বন রক্ষক আমলার কোটি কোটি টাকা নগদে এবং সম্পত্তিতে আরো কয়েকশ কোটি টাকার মালিকানার কথা শুনলে কেমন মনে হতে পারে?

উপাচার্যনামা

শুধু কি রাজনৈতিক নেতা বা আমলা? মোটেও নয়। সবসময়ই শুনে আসছি একটি সমাজের পচন ধরে মাথা থেকে। আমাদের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অতি সম্মানিত উপাচার্যদের দুর্নীতি ও লুঠ এবং অতি লোভের কথাও দেখছি প্রতিনিয়তই। শ্রদ্ধেয় লেখক এবং সম্মানিত শিক্ষক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বিগত সরকারের শাসনামলে এই শ্রেনীর কিছু সংখ্যক দুর্নীতিবাজের কথা লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই, কোন ফললাভ হয়নি। একজন শিক্ষক রাষ্ট্রপতির কাছেও তিনি অনেকই অনিয়মের প্রতিকার চেয়েছিলেন নানাভাবে। হয়নি। কারন রাজনৈতিক দলাদলি ও রাজনৈতিক আনুগত্য যখন উপাচার্যের মতো একটি প্রতিষ্ঠান হবার যোগ্যতায় পরিণত হয় সেখানে মেধার খোঁজ কে রাখে? ফলে, যা হবার তাই হয়। একজন উপাচার্য নাকি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার থাকা সত্ত্বেও তার স্ত্রীর নামে গড়া উত্তরার বাসভবন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ভাড়া নিয়ে

সেটাকেই নিজের বাসভবন হিসেবে ঘোষনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ওই বাসভবনের সকল আসবাব, ডেকোরেশন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই অর্থে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত তার কোয়ার্টারটিকে ভিআইপি গেস্ট হাউজে রূপান্তরিত করেন, যেখানে নাকি একছরেও কোন গেস্ট যাননি। এই উপাচার্যকে কি প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক বলা যাবে না তষ্কর বলতে হবে? এইভাবে গত কয়েকমাসে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যদের যা কেচ্ছা দেখছি সেগুলোর কথা সব উল্লেখ করতে হলে একটি উপাচার্যনামাই লিখে ফেলতে হবে। সেই অপচেষ্টা আর নাই বা করলাম।

ব্যবসায়িদের দুস্কৃতি

একজন ব্যবসায়ী হাসেম সাহেব। অত্যন্ত সফল তিনি। জাগুয়ার ও পোরশে নাকি রোলস রয়েস গাড়ি কিনে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন এই দরিদ্র দেশে। ব্যবসা করছিলেন, ভালোই করছিলেন। কিন্তু, আরো অনেক ব্যবসায়ির মতো তারো দিলে ইরাদা হলো, সাংসদ হবার, চাই কি মন্ত্রী হবার। ফলে যা হবার তাই হলো, সব কুকর্মের সাথে আটক হয়ে গেলেন যৌথ বাহিনীর হাতে। তিনিও আটকাবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদে বেকারার হয়ে নাকি বলে দিয়েছেন যে, শুধু ঢাকা ও আশপাশেই তিনি বা তার কোম্পানী প্রায় পাঁচশ বিঘা জমি অবৈধ দখলে নিতে সক্ষম হয়েছেন। কেউ কি বলে দেবেন, এই পরিমান জমির দাম কতো হতে পারে? কারন আমার এই ছোট্ট দরিদ্র মস্তিষ্কে অ্যাতো হিসাব ধরবেনা কিছুতেই। তার আরো অনেক সুকৃতি নাকি আছে। সেগুলো নিশ্চয়ই ক্রমশঃ প্রকাশিত হবে। তবে এই ধনী ব্যক্তিটিকে প্রিজন ভ্যানের মতো নিকৃষ্ট যান থেকে নামতে দেখে এই অধমের দয়ার প্রাণে কষ্ট হয় বড়োই। আচ্ছা প্রিজন ভ্যানে অন্ততঃ এসি লাগাবার ব্যবস্থা করা যায় কি না এই বিষয়টি একটু ভেবে দেখতে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট সবাইকে। কারণ, এখন যতো সব ভিআইপি বন্দিকে এই নৈকষ্য কুলীন প্রিজন ভ্যান থেকে নামতে দেখে জিয়া বেকারার হয়ে যাচ্ছে। কি দুঃখ, কি দুঃখ।

আরেকজন নামি ব্যবসায়ি আবদুল আউয়াল মিন্টু। তিনিও নাকি যৌথ বাহিনীর কাছে গড়গড় করে তার সব সুকর্মের কথাই স্বীকার করে গেছেন অতীব আনন্দের সাথে। এমনকি তার যে একটি ভুয়া কোম্পানী আছে সেটাও নাকি স্বীকার করে ফেলেছেন। আচ্ছা, এই ভুয়া কোম্পানীর কথা তিনি স্বীকার না গেলে কি পারতেননা?

আর কার কথা বলবো? অ্যাতো বলতে গেলেতো সাতকাহন হয়ে যাবে। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা? জনাব মোসাদ্দেক হোসেন ফালু? আবদুল আউয়াল মিন্টু? ওবায়দুল কাদের? সালমান এফ রহমান? বসুন্ধরা গ্রুপের আহমদ আকবর সোবহান? ব্যারিস্টার আমিনুল হক? কাকে ছেড়ে কার কথা বলি?

বাংলাদেশের দৈনিক প্রথম আলো দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা করে, সাবেক সাংবাদিক হিসেবে এই প্রত্যয়টুকু আমার আছে। আর অ্যাতোক্ষন যা বলেছি সব প্রথম আলোতেই ছাপা বিভিন্ন সংবাদের ভিত্তিতেই। ওইসব সংবাদের প্রতিবাদ কেউ করেননি, তাই বিশ্বাস হয় সবই সত্যি। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল জলিল অনেক কথাই বলেছেন নাকি যৌথ বাহিনীর কাছে। তাতে তার নেত্রী শেখ হাসিনা জড়িয়ে পড়েন। জলিল আরো নাকি বলেছেন যে, দ্রব্যমূল্য অস্থিতিশীল করার জন্যে যে সিন্ডিকেট গঠিত হয়েছিল তাতে আওয়ামী লীগ-বিএনপি দুই দলেরই নেতারা ছিলেন। কি রাজযোটক! আচ্ছা, তাদের প্রায় সবাইতো আইনপ্রণেতা ছিলেন। সুতরাং আশা করতে পারি তাদের সিন্ডিকেটেরও আইনগত ভিত্তি ছিল। ছিল সংবিধান বা গঠনতন্ত্রও! কারণ, তাদের সবাইইতো প্রচন্ড রকম গনতান্ত্রিক। এখন জানার বিষয় তাদের সদস্য সংখ্যা কতোজন ছিল এবং তাদের পোর্টফোলিও কি গনতন্ত্রের ভিত্তিতে বিতরিত হয়েছিল? জলিলের ভাষ্য, ওই সিন্ডিকেটের নেতুবৃন্দের মধ্যে ছিলেন হাজী সেলিম, শেখ হেলাল, আবদুল আউয়াল মিন্টু, এম. এ হাসেম ও বরকতউল্লাহ বুলু। এরাই সব আমাদের দন্ডমুন্ডের কর্তা ছিলেন বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন মেয়াদে। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে!

আর কি লিখি?

অ্যাতোক্ষন যা লিখেছি তাতেই আবার আমার শয্যাশায়ী হয়ে থাকার মেয়াদ বেড়ে গেল কিনা জানিনা। এখন অনেকেই দাবি করছেন অ্যাতোসব দুস্কৃতির দায়িত্ব নিয়ে দুই নেত্রীরই অবসর নেয়া উচিত বা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। তারা তা যাবেন কি না সন্দেহ। কারণ, ক্ষমতার মোহের বলয় থেকে তারা কতোটুকু বেরিয়ে আসতে পেরেছেন কে জানে? তাছাড়া সরকারও আর তাদের যেতে দিতে রাজি কি না সেসম্পর্কেও সংশয় অনেকই। কারণ, সরকার শেখ হাসিনাকে সাবজেলে এবং খালেদাকে প্রায় জেলে রেখে দিয়েছেন। তবে, খালেদা মনের সুখে তথাকথিত টেলিকনফারেন্সিং করে যাচ্ছেন সেই সব নেতা কর্মীদের সাথে যাদের সাথে কোন কথা বলার ফুরসতই তার ছিলনা ক্ষমতার নিগড়ে বন্দী থাকার সময়ে। এখন এই নেতারা বা আরো কেউ দেশে গনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি তুললে একটাই প্রশ্ন করতে হয়, আবার দ্রুত নিশ্চিত করার জন্যেই কি গনতন্ত্র আনার নামে এই সব দুর্বৃত্তকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ করে দিতে হবে?

একথা সত্যি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে দেশের মানুষের প্রানান্তকর অবস্থা। কিন্তু, আমাদের ওইসব গনতান্ত্রিক নেতাকে আবার দায়িত্বে ফিরিয়ে আনলে কি দ্রব্য মূল্য কমে যাবে হঠাৎ করেই? গনতন্ত্রের চিৎকার আর নির্বাচনের কথা শুনতে শুনতে আমাদের মতো আম জনতার অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। শুধু একটাই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে গনতন্ত্রের প্রবক্তাদের, পেটে ভাত না থাকলে আর দেশ ভর্তি চোর থাকলে গনতন্ত্র দিয়ে কি হবে? নেতাদের চাঁদাবাজির উপাখ্যান পড়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আরো একটা প্রশ্ন এসে যায়, যাদের কথা লিখেছি এবং যাদের কথা শুনছি তাদের কাছেই কি আমরা এই দেশের ভবিষ্যত সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম? না কি আবার তাদের কাছেই আমরা আমাদের যুদ্ধে জেতা দেশটাকে ছেড়ে দেব?

বর্তমান সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে যারা বসে আছেন তাদের অনেকের মধ্যে সৎ মানুষেরই প্রতিচ্ছবি দেখি। আন্তরিকতারও কোন ঘাটতি আছে বলে মোটেও মনে হয়না। কিন্তু, রাজনীতির নামে যে মোহ-মাৎসর্যের খেলা আমরা দেখেছি তার অশুভ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা যে কতো কঠিন তা কেই বা সঠিকভাবে বলতে পারে। এত্তা জঞ্জাল চারদিকে। তবুও আশা করতে বড়োই ইচ্ছে হয়, এদেশে একসময় সৎমানুষেরাই শাসন ক্ষমতায় আসবেন। তখন গনতন্ত্রের কথা শুনতেও ভালো লাগবে।

অথঃ সংস্কারনামা

রাজনৈতিক দলগুলোতে বিশেষ করে বড় দলগুলোতে এখন সংস্কারের হাওয়া। প্রত্যেক দলেই এক ব্যক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে মতামত গড়ে উঠছে জোর। আওয়ামী লীগে সংস্কার পন্থীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, মাহমুদুর রহমান মান্না, মুকুল বোস প্রমুখ। বিএনপিতে বেশি সোচ্চার আছেন সাবেক সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল মাহবুবুর রহমান, সাখাওয়াত হোসেন বকুল সহ বেশ ক'জন। সবে মাত্র সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানও বিএনপি'র এই সংস্কারপন্থীদের পক্ষাবলম্বন করেছেন বলে সংবাদপত্রে দেখলাম। দুই পূত্রের আকাশচুম্বি দুর্নীতি এবং সরকারী অর্থে নিজের বাগানবাড়ি সাজানোর দায় সাইফুর রহমান কোন সংস্কার দিয়ে ঢাকবেন, সেটা জানতে বড়োই ইচ্ছে করে।

শেষ কথা

বেশ কিছুদিন আগে টাঙ্গাইলে বৃক্ষরোপন অভিযান চালু করতে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ প্রায় একঘন্টা ধরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এই সময়ই তিনি হিট স্ট্রোকে মূর্ছা যান। পরে জানা গেল, না তিনি সুস্থ আছেন। এখন একটাই কথা বলতে চাই, মাননীয় ফখরুদ্দীন স্যার এইসব বৃক্ষরোপন জাতীয় কাজের জন্যে অনেক লোক পাওয়া যাবে। এই কাজে আপনাকে যেতে হবে কেন?

সারা দেশের সাধারণ মানুষ যে আপনাদের দিকে চেয়ে আছে আরো অনেক বড়ো কাজ সমাধা করার জন্যে।

হিফজুর রহমানঃ লেখক/গবেষক

E-mail: hifzur@dhaka.net

লেখকের অন্যান্য লেখাগুলো পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন